আমি এক অনন্য মানুষ আমরা এক মহান জাতি

কোয়ান্টাম বুলেটিন

মার্চ ২০১৮

ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতামূলক আলোচনায় গুরুজী

আপনার সন্তানকে বাঁচাতে পারেন আপনিই

আপনার সন্তান আপনার ভবিষ্যৎ। আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও সঠিক জীবনদৃষ্টির পথ ধরে বেড়ে উঠলে সে-ই একদিন আলোকিত করতে পারে জাতিকে। তার কর্মে-স্বপ্নে দেশকে সে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে অনন্য উচ্চতায়। কিন্তু আপনার এ সন্তানই যদি হয়ে পড়ে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-চক্রান্তের শিকার, নিত্যনতুন প্রযুক্তিপণ্যের নিয়ন্ত্রণহীন ও অপরিণামদর্শী ব্যবহারের ফলে ক্রমশ লক্ষ্যহীন, কর্মবিমুখ, আত্মহত্যাপ্রবণ–তবে তা নিশ্চিতই হয়ে দাঁড়ায় গুরুতর দুশ্চিন্তার কারণ।

তাই অমিত সম্ভাবনাময় আমাদের সন্তানদের আজ বাঁচাতে হবে প্রযুক্তিপণ্য-আসক্তির সর্বনাশা ছোবল থেকে। আর এ উদ্যোগের সূচনা করতে হবে নিজের পরিবার থেকেই। কারণ আপনার সন্তানকে বাঁচাতে পারেন আপনিই।

সম্প্রতি কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

তিনি বলেন, ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল-ভিডিও-অনলাইন গেম ও স্মার্টফোন-ইন্টারনেট আসক্তি আজ রূপ নিয়েছে ক্রমবর্ধমান এক বৈশ্বিক মহামারীতে। এ সর্বগ্রাসী মড়ক আজ একদিকে যেমন হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে ব্যক্তিমানুষের মনোদৈহিক সুস্থতা, তেমনি দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে পারিবারিক শান্তি ও সামাজিক স্বস্তি।

পৃথিবীজুড়ে প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণাগারে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রতিবেদন মতে, এসব প্রযুক্তি উদ্ভাবনই করা হয়েছে এমনভাবে–যাতে যে-কোনো বয়সী মানুষ, বিশেষত শিশু-কিশোর-তরুণরা সহজেই এতে আসক্ত হয়ে পড়ে। জীবনের লক্ষ্য ভুলে যাতে নিশ্চিন্তে মেতে থাকে অর্থহীন স্থূল বিনোদনে। এসব কথা স্বীকার করেছেন খোদ এসব প্রযুক্তি-উদ্ভাবকরাই।

কিন্তু হলে কী হবে? কখনো আধুনিকতার নামে, কখনো-বা নিছক স্ট্যাটাস বজায় রাখতে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছেই। সচেতনতার অভাবে অভিভাবকরাই এসব আসক্তিকর উপাদান তুলে দিচ্ছেন সন্তানের হাতে। এভাবেই প্রয়োজনের মাত্রা ছাপিয়ে বাড়ছে প্রযুক্তিপণ্যের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার।

আর এই অপব্যবহারের পরিণতি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি খোলা চোখেই। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখা মেলে তুচ্ছ সব কারণে সহিংসতা, নারী-শিশু নির্যাতন, পারিবারিক অশান্তি আর সামাজিক অস্থিরতার মর্মঘাতী বিবরণ। সেইসাথে এসব প্রযুক্তিপণ্যে আসক্ত কিশোর-তরুণদের একটি অংশ ইতোমধ্যেই হয়ে পড়েছে বিষণ্নতা-অবসাদের আক্রমণে লক্ষ্যহীন, নিষ্ক্রিয় ও দিগভ্রান্ত। আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিচ্ছিন্নতা আজ ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত করে চলেছে গোটা পৃথিবীর প্রায় সব মানুষ ও পরিবারকে। সবমিলিয়ে বলা যায়, মানবসভ্যতা অতীতে কখনোই এমন বিপন্ন হয়ে ওঠে নি।

তাই জীবনক্ষয়ী এ ভার্চুয়াল ভাইরাসের পরিণাম ও ভয়াবহতা সম্বন্ধে এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সচেতনতা। প্রথমত, নিজে এ আসক্তি থেকে মুক্ত থাকুন। দ্বিতীয়ত, সন্তানকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিটি পরিবারে গড়ে তুলুন সংহত প্রতিরোধ।

অবশ্য আশার কথা, সমাজের মানুষ এ ব্যাপারে দিন দিন সতর্ক হয়ে উঠছেন। এর পাশাপাশি তারা সচেতন করে তুলছেন চারপাশের মানুষকেও। আর এক্ষেত্রে শুরু থেকেই অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে আসছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ২০০৯ সাল থেকেই ফেসবুকসহ সব ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তির ব্যাপারে সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করছে কোয়ান্টাম।

এরই ধারাবাহিকতায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা এ বছরের শুরু থেকেই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি অফিস, পার্ক-শপিং সেন্টারসহ জনবহুল স্থানে তারা বিতরণ করছেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ সম্বলিত বিশেষ স্টিকার, ফোল্ডার ও বুলেটিন। পরিচিতদের মাঝে শেয়ার করছেন সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপ ও ডকুমেন্টারি, যা ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বিশ্বাস করে–নতুন সহস্রাব্দে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো মেধা, যোগ্যতা ও কর্মস্পৃহা সবই রয়েছে আমাদের। প্রয়োজন শুধু প্রচলিত স্রোতে হারিয়ে না গিয়ে লক্ষ্যে অবিচল থাকা। আর এজন্যে চাই সব ধরনের আসক্তিমুক্ত ও ইতিবাচক সমমর্মী তরুণ প্রজন্ম। তাই আপনিও সচেতন হোন ভার্চুয়াল ভাইরাসের আগ্রাসন থেকে। বাঁচুক আমাদের সন্তান, আমাদের পরিবার। বাঁচুক প্রিয় মাতৃভূমি।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪৪৩ ব্যাচ ॥ উত্তরা
৩০, ৩১ মার্চ, ১ ও ২ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার
উত্তরা, ঢাকা

৪৪৪ ব্যাচ ॥ কুষ্টিয়া
৬, ৭, ৮ ও ৯ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : দিশা টাওয়ার
উপজেলা মোড়, কুষ্টিয়া

৪৪৫ ব্যাচ ॥ ঢাকা
১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

৪৪৬ ব্যাচ ॥ সিলেট
২০, ২১, ২২ ও ২৩ এপ্রিল
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
স্থান : আমানউল্লাহ কনভেনশন সেন্টার
আরামবাগ, সিলেট

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

উপদেশ নয়, শিশু চায় দৃষ্টান্ত

আবুল মোমেন

বিশিষ্ট কবি, লেখক ও কলামিস্ট আবুল মোমেন। ১৫ ডিসেম্বর ২০১৭ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন তিনি। তার বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আমাদের দেশে শিশুরা আজ সবচেয়ে বঞ্চিত। সেটা ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে। বঞ্চিত এই অর্থে যে, আমরা ধরেই নিয়েছি ভালো জামা-কাপড়, ভালো খাবার এগুলোই হচ্ছে শিশুর চাহিদা। এর বাইরে আমরা বেশি কিছু ভাবি না।

কিন্তু বাইরে হয়তো রোদ উঠেছে, শিশুর ইচ্ছে করবে মাঠে গিয়ে দৌড়াতে, গাছে উঠতে। তার লাফ দিতে ইচ্ছা হয়, পুকুরে সাঁতার কাটার ইচ্ছা হয়। শৈশবে এমন ক্ষুধার কোনো শেষ নেই। তার যেমন আছে চিংড়ি মাছ খাওয়ার ক্ষুধা, তেমনি রয়েছে মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার ইচ্ছা তার আরো বেশি। কিন্তু সেগুলো অতৃপ্ত থেকে যাচ্ছে।

আমরা সাধারণভাবে যে ধরনের ঘরবাড়িতে থাকছি, এই ফ্ল্যাটবাড়িগুলো হচ্ছে খাঁচার মতো। দরজাটা লাগিয়ে দিলে পুরো দুনিয়া থেকে আপনি বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। এটা শিশুর মনে বন্দিত্বের বিরাট একটা চাপ সৃষ্টি করে।

আমি সৌভাগ্যবান যে, প্রাক-প্রাথমিক থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়েছি। একবার ক্লাস ফোরের বাচ্চাদের সাথে আমরা একটা মুক্ত আলোচনা করলাম যে, মানুষ আসলে ইনডোর প্রাণী না আউটডোর প্রাণী। সেখানে অনেক তর্ক-বিতর্ক করল শিশুরা। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মানুষ আসলে আউটডোর প্রাণী। ভুল করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা অনেক আগে বলেছিলেন যে, শিশুকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। এমনভাবে ছাড়া উচিত যাতে তার গায়ে ধুলোবালি লাগে, বৃষ্টি জলে সে যেন একটু ভেজে।

শিশু আলাদা থাকতে চায় না। সে চায় মানুষের সংস্পর্শ। আপনি যদি তাকে সবার থেকে আলাদা করে রাখেন যে সাফ-সুতরা থাকবে, পরিষ্কার থাকবে তাহলে শিশুর যে স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, এটা থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। বন্ধুদের সাথে সে গলাগলি করবে, ঝুলাঝুলি করবে, ধাক্কাধাক্কি করবে, ফুটবল খেলবে। এ স্বাধীনতাটুকু তাকে দিতে হবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর তিন ধরনের বিকাশ প্রয়োজন হয়। একটা হচ্ছে শারীরিক, একটা মানসিক, আরেকটা হচ্ছে আবেগিক বিকাশ। শরীরেরটা আমরা দেখতে পাই যে খাওয়াদাওয়া করছে, আকারেও বাড়ছে। আবার শিশুকে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে আমরা মনে করেছি যে, লেখাপড়া করলেই সব হয়ে যাবে। ফলে এখন আরেকটি জিনিসের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। তা হলো, অনেক অনেক পরীক্ষা। এখন আর কেউ শিক্ষার্থী নেই, সকলেই পরীক্ষার্থী। আমি মনে করি, এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের খুব ক্ষতি হচ্ছে।

কারণ প্রাথমিক থেকে অষ্টম-নবম শ্রেণি পর্যন্ত জীবনটা হচ্ছে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করার সময়। সে চতুর্দিক থেকে সংগ্রহ করবে। তার কাছে তো আমি তখন ফল চাইতে পারি না।

অথচ এখন অভিভাবকরা ক্লাস ওয়ান থেকেই সন্তানকে জিপিএ ফাইভের জন্যে তৈরি করছেন। এর ফলটা দাঁড়িয়েছে স্কুলের চেয়ে কোচিং সেন্টারের মূল্য বেড়ে গেছে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে এখন দাম বেশি গাইড বইয়ের। শিক্ষকের চেয়ে হাউজ টিউটরের দাম বেশি। শিক্ষার চেয়ে বেশি দাম পরীক্ষার। উল্টো যাত্রা হয়ে গেল সব।

> শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, শিশু চায় দৃষ্টান্ত। সে কোনোকিছু সরাসরি শিখে না। সবকিছু দেখে দেখে শেখে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করে।

আপনি যখন জীবনে প্রবেশ করবেন, তখন কি কেউ জানতে চাইবে–আপনি গণিতে কত নম্বর পেয়েছেন? ইংরেজিতে কত নম্বর পেয়েছেন? এটা তো কেউ জিজ্ঞেস করে না। জীবনের আসল চাহিদা হচ্ছে আপনার বিবেচনা বোধ কেমন–আপনি কি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? আপনার মাঝে বিচক্ষণতা, সেবাপরায়ণতা, মানবিকতা, বন্ধুপ্রীতি আছে কিনা। জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন কিনা। আপনি কঠিন সময়ে ভেঙে পড়েন, নাকি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন?

জীবন আপনাকে এসব চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে আর স্কুল বলছে, শুধু পরীক্ষায় পাশ করো। লেখাপড়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এর সাথে সাথে মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটানো আরো গুরুত্বপূর্ণ।

শিশুদের নিয়ে কাজের ৪১ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি–সরাসরি উপদেশ দিলে শিশু কখনো কিছু শেখে না। শিশু সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করে উপদেশ, শিশু চায় দৃষ্টান্ত। সে কোনোকিছু সরাসরি শিখে না। সবকিছু দেখে দেখে শেখে। সে খুব ভালো অনুকরণ করতে পারে। শিশু যে-রকম বড়দের জুতা পরে, শাড়ি পরে, স্বভাবটাও সে বড়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করে।

মা-বাবা ঝগড়া করবেন আর আশা করবেন সন্তান শান্তশিষ্ট হবে, খুব যৌক্তিক আচরণ করবে, এটা হবে না। এমন দৃষ্টান্ত দিতে হবে তার সামনে, যেন সে বুঝতে পারে কোনটা সত্য, কোনটা বেশি গ্রহণযোগ্য।

এখন মুশকিল হয়েছে, সন্তানদের দেয়ার মতো সময় আমাদের নেই। ইংরেজিতে আমরা বলি 'কোয়ালিটি টাইম'। আপনি যখন ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরছেন, তখন সে কিছু একটা বললে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন। বলছেন, চুপ করো। সন্তান কাছে এলেই তাকে থামিয়ে দিচ্ছেন, তার সাথে বসাটা মুলতবি করছেন। আমি শুধু অভিভাবকদের বলব–শিশুর জন্যে আপনার সময়টা বাড়ান। ওদের পাঁচ রকম পাখি দেখান, গাছ দেখান, ফুল চেনান। এটিই শিক্ষা।

একবার পড়ালেখা শিখলে বই সে একাই পড়তে পারবে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বয়স উপযোগী অন্যান্য শিক্ষাটা ওর হচ্ছে কিনা। তাকে লার্নিং অব লাইফ দিতে হবে। এ শিক্ষা আমাদের দেশে স্কুল-কলেজ দেয় না, তাই এ কাজ করতে হবে বাবা-মা-অভিভাবকদেরকেই।

আপনিও যদি জিপিএ ফাইভের ফাঁদে পড়ে যান, তাহলে আপনার সন্তান সামগ্রিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হবে। তার হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধার বিকাশ হলো, অঙ্কে-ইংরেজিতে সে দুর্দান্ত নম্বর পেল কিন্তু তার মানবিক বোধগুলো বিকশিত হবে না। তখনই দেখা যায়, সে নানারকম ভুলভ্রান্তি করে। কারণ তার মূল্যবোধের জায়গাটা তো ফাঁকা!

আমি অনেকদিন থেকে এ কথাটাই বলছি–একটা প্রজন্ম তৈরি হয়েছে যারা সত্য-মিথ্যার প্রভেদ বুঝতে পারে না। সত্য যদি ১০০ হয়, মিথ্যা তো শূন্য। অথচ সে ভাবে, মিথ্যা ৮০। মিথ্যা দিয়েও সত্যের কাছাকাছি যাওয়া যাবে। এ বিষয়টাই সবচেয়ে ভয়ংকর। এভাবে সমাজ বেশি দূর যেতে পারবে না।

সমাজের এই যে সংকট, এটা কিন্তু ছোট ছোট জায়গা থেকেই মেরামত হতে হবে। অর্থাৎ আপনি আপনার পরিবারের মধ্যে যদি সত্য আর মূল্যবোধের চর্চাটা শুরু করেন, তাহলে সেটা একসময় চারপাশকে প্রভাবিত করবে। আমি হতাশ হই না। কারণ সততা, কল্যাণ বা যা-কিছু ভালো, সেটার জোর এত বেশি যে, কোনো ব্যাধি বা অকল্যাণ এর সামনে টিকতে পারবে না।

তবে এর জন্যে ভালো বিষয়গুলো নিয়মিত চর্চার মধ্যে আনতে হবে। একবার যদি এটা চর্চার আওতায় আনা যায় যে, বাড়িতে আমরা কিছুতেই কপটতা করব না, তাহলে শিশু সেভাবেই বেড়ে উঠবে। চারপাশে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল আমাদের নিজেদেরই পরিষ্কার করতে হবে। সবাইকে সত্যের ওপর দাঁড়াতে হবে, দাঁড়াতে হবে ইতিহাসের সঠিক রাস্তায়। আর এভাবেই শিশুর সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে একটা স্পষ্ট, সৎ ও অকপট সম্পর্ক।

অনুলিখিত

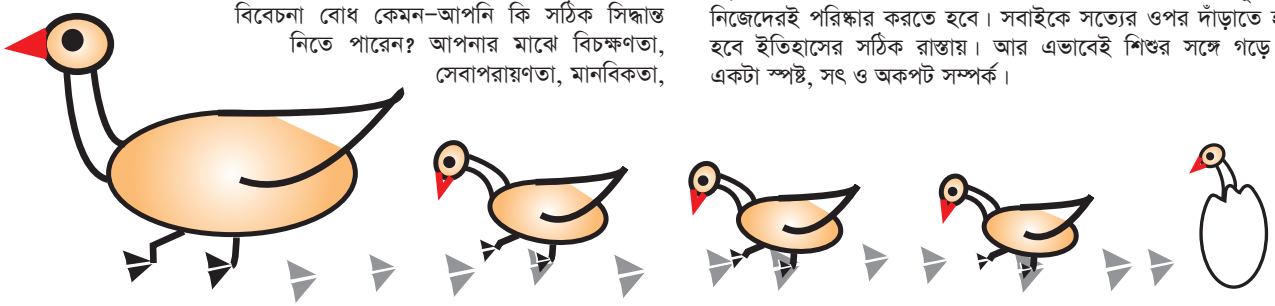

একাগ্র মনোযোগ ও সুতীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির জন্যে—

সন্তানকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন

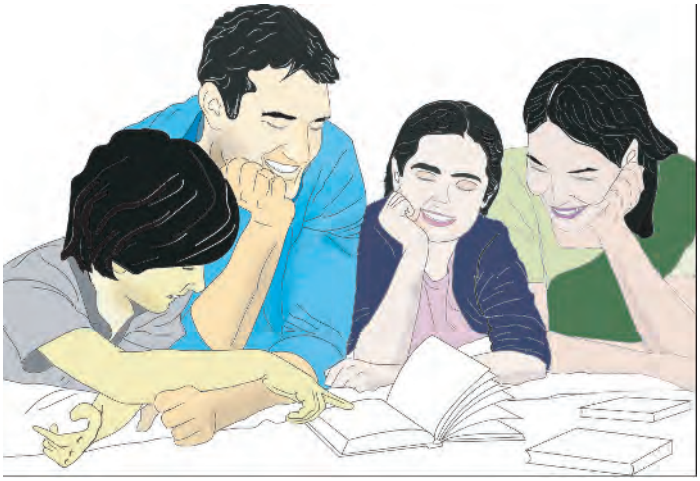

শৈশবে গোপাল ভাঁড়, নাসিরুদ্দীন হোজ্জার গল্প কিংবা দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি* পড়েন নি এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। আজকালকার শিশুরা অবশ্য এসব পড়ে না। টিভি বা ইউটিউবে চিরায়ত গল্পের অ্যানিমেশন ভার্সন দেখে তারা। কিন্তু বই পড়ার চেয়ে এটা ভালো হচ্ছে কি?

নিউরোসায়েন্টিস্টরা বলছেন, একদমই না। ব্যায়াম করলে মাংসপেশী যেমন সুদৃঢ় হয়, মস্তিষ্কেরও তেমনি ব্যায়াম প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে টাফটস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর রিডিং এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ-এর পরিচালক মারিয়ান উলফ বলছেন, বই পড়ার সময় পাঠক নিজের মতো করে একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করে নেন। প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্যে থেমে চিন্তাও করতে পারেন। ফলে পঠিত অংশের অন্তর্নিহিত অর্থটা বোঝা তার জন্যে সহজ হয়। অন্যদিকে পর্দায় কিছু দেখা বা শোনার সময় তিনি কিন্তু 'পজ বাটন' চেপে চিন্তা করেন না।

এ প্রসঙ্গে *আলোকিত মানুষ চাই* আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, 'আলোকিত বা শ্রেয়োবোধসম্পন্ন মানুষ যে ইলেকট্রনিক মাধ্যমের ভেতর থেকে গড়ে উঠবে সে আশা খুবই ভুল। ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুব ক্ষিপ্র এবং দ্রুতগামী। কোনো জিনিসকে আত্মস্থ করতে যে সময়ের দরকার হয়–এ মাধ্যম আমাদের হৃদয়কে সে সময় দেয় না। ধাবমান, দ্রুতগামী হরিণের মতো তা আমাদের চোখের সামনে থেকে চকিতে হারিয়ে যায়। আমাদের ভাবার, বোঝার, উপলব্ধি করার এবং সমৃদ্ধ হওয়ার সময় এই মাধ্যম আমাদের দেয় না।

ওটা সবচেয়ে ভালো পারে কেবল একটিমাত্র মাধ্যম: 'বই'। বইকে আমরা পড়ি থেমে থেমে, বুঝে বুঝে, রসিয়ে রসিয়ে, উপলব্ধি করে করে। এর বোধগুলোকে আমাদের স্মৃতির তাকে সাজিয়ে রেখে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আমরা অবহিত মানুষ হই; কিন্তু বইয়ের মধ্য দিয়ে হই গভীর মানুষ।' *(বই ও আকাশ-সংস্কৃতি)*

স্মৃতিশক্তিকে সুতীক্ষ্ণ করে বই

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসকিনস ল্যাবরেটরির গবেষণা বিভাগের পরিচালক ড. কেনেথ হিউ জানাচ্ছেন, যখন কেউ বই পড়ে, তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষম একটি যোগাযোগ গড়ে ওঠে, যা তার স্মৃতিশক্তিকে সুতীক্ষ্ণ করে। আমেরিকান একাডেমি অব নিউরোলজি-র জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বই পড়ুয়াদের মস্তিষ্ক অন্যদের তুলনায় বার্ধক্যে অধিকতর সজীব ও সচল থাকে।

পড়ার অভ্যাস কেবল স্মৃতিশক্তিকেই প্রভাবিত করে না। এমোরি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, জীবনঘনিষ্ঠ গল্পগাথা পড়লে নিউরোনের সংযোগায়ন বাড়ে। সেইসাথে বাড়ে সমমর্মিতাবোধ ও আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা, যা মানসিক চাপ কমায়। এর ফলে একজন মানুষ দীর্ঘ জীবন ও সুস্বাস্থ্য লাভ করেন।

সন্তান হবে মনোযোগী শিক্ষার্থী

সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিপণ্যের অনাকাঙ্ক্ষিত দৌরাত্ম্যে মানুষের মনোযোগ-সময়সীমা অতীতের তুলনায় মারাত্মকভাবে কমছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে কোমলমতি শিশুরা। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো অধ্যাপক সুসান গ্রিনফিল্ড এই সমস্যার দাওয়াই হিসেবে মা-বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন, সন্তানকে বেশি বেশি গল্পের বই পড়তে উৎসাহ দিন।

তার মতে, প্রতিটি গল্পের একটি শুরু, ধারাবাহিকতা ও শেষ থাকে, যা মস্তিষ্ককে একটি সিকোয়েন্স অনুসরণ করতে উৎসাহ জোগায়। শিশুকে ঘটনার তাৎপর্য ও কার্যকারণের সাথে পরিণতির সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে। এবং এই দক্ষতা শৈশবেই আয়ত্ত করা মস্তিষ্কের সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে অত্যন্ত জরুরি। শিশু যত বেশি বই পড়বে, এই দক্ষতাও তার তত বৃদ্ধি পাবে।

বই দেয় আনন্দময় শৈশব ও সফল ক্যারিয়ার

বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের খ্যাতি তখন তুঙ্গে। একবার একজন ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি চাই আমার সন্তান বড় হয়ে যেন সফল বিজ্ঞানী হতে পারে। তাকে কী ধরনের বই পড়ানো উচিত?' আইনস্টাইন জবাব দিলেন, 'সন্তানকে রূপকথা পড়ান।'

ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা। বললেন, 'আর কী পড়াব?' আইনস্টাইন হেসে বললেন, 'আরো আরো রূপকথার বই। কারণ একজন প্রকৃত বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হলো সৃজনশীল কল্পনা। রূপকথা পড়ার মধ্য দিয়ে শৈশবেই একজন মানুষ সেই গুণ অর্জন করতে পারে।'

সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাও আইনস্টাইনের এই বক্তব্যকে সমর্থন করছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী, যে-কোনো টিভি অনুষ্ঠানের তুলনায় শিশুতোষ বই শিশুর শব্দভাণ্ডারকে দ্বিগুণ সমৃদ্ধ করে। ফলে রিডিং টেস্ট ও বুদ্ধিমত্তা যাচাই পরীক্ষায় শিশুতোষ বই পড়ার অভ্যাস আছে এমন শিশুরা বেশি নম্বর পায়। পরবর্তী জীবনেও তারা অন্যদের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকে।

তাই সন্তানকে বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। বইয়ের রাজ্যে তার শৈশব হোক আনন্দময়।

তথ্যসূত্র : সাইকোলজি টুডে, ৪ জানুয়ারি ২০১৪; দ্য আটলান্টিক, ৮ জুলাই ২০১৩; টাইম, ২৭ অক্টোবর, ২০১৬

অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না–বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৃথিবীর আর সব সভ্যজাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা ততই আরব্য উপন্যাসের একচোখা দৈত্যের মতো ঘোঁত ঘোঁত করি। চোখ বাড়াবার পন্থাটা কী? প্রথমত : বই পড়া এবং তার জন্য দরকার বই পড়ার প্রবৃত্তি।

সৈয়দ মুজতবা আলী

পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়া হচ্ছে বৃক্ষের মতো একটু একটু করে আকাশের কাছে যাওয়া।

সৈয়দ শামসুল হক

বই পড়ার অভ্যাস নেই আর বই পড়তে পারে না (নিরক্ষর) এমন মানুষের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই।

মার্ক টোয়েন (মার্কিন লেখক)

বই পড়তে শেখাটা হলো আগুন জ্বালানো। আর প্রত্যেকটি বর্ণ যেন একেকটি উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ।

ভিক্টর হুগো (ফরাসি সাহিত্যিক)

টেলিভিশনে কিছু দেখার সময় একজন মানুষ সেটা সরাসরি দেখে। কল্পনার কোনো সুযোগ তার নেই। কিন্তু যখন বইতে পড়ছে 'নীল আকাশ', সেখানে নীলও নেই, আকাশও নেই। কিছু অক্ষর ছাপা আছে। রেটিনা দিয়ে অক্ষরগুলো ব্রেনে পৌঁছাচ্ছে। ব্রেন সেটাকে বিশ্লেষণ করে কল্পনা করছে। অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড এই প্রক্রিয়া যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের ব্রেন বিকশিত হয় না। তাই বই পড়তে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কোনো শিশু বই পড়া শিখে গেলে তাকে নিয়ে আমরা আর কোনো চিন্তা করি না।

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সন্তান ও সমাজকে দেয়া একজন মানুষের সবচেয়ে বড় উপহার–শিশুদের বই পড়ে শোনানো।

কার্ল স্যাগান (মহাকাশবিজ্ঞানী ও জ্যোতির্পদার্থবিদ)

একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে বই পোড়ানোর কোনো দরকার নেই। শুধু বই পড়া থেকে মানুষকে বিরত রাখতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হবে।

রে ব্র্যাডবারি (মার্কিন লেখক)

সচেতন হোন আপনিও

কর্মব্যস্ত দিনের শেষে আপনি ঘরে ফিরছেন ঠিকই, কিন্তু সত্যিই পরিবারের কাছে ফিরছেন কি? শিশুসন্তানটি আপনার সান্নিধ্য যতটা চায়, এর চেয়ে তার বেশি আগ্রহ কি আপনার স্মার্টফোন বা ল্যাপটপটির প্রতি? কিছুদিন আগেও যে দুরন্ত ছেলেটি দুপুর গড়াতেই খেলার মাঠে যাওয়ার বায়না ধরত, সে-ই কি এখন দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকে নিজের ঘরে? রাত-দিন এত যোগাযোগ, এত মানুষের ছবি দেখা-খবর নেয়া, তারপরও কি পরিবারের চেনা মানুষগুলোকেই খুব দূরের মনে হয় আজকাল?

মাত্র কয়েক বছরেই পরিবার, সমাজ, সারা পৃথিবীর দৃশ্যপটগুলো এভাবেই বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। জীবনকে আরো সহজ করবে বলে যে ইন্টারনেট আর প্রযুক্তিপণ্যকে মানবজাতি স্বাগত জানিয়েছে, তা-ই আজ এক ভয়াবহ আসক্তির নাম। চারপাশের অনেক মানুষই আজ ভার্চুয়াল ভাইরাসে আসক্ত কিংবা পরোক্ষ ভুক্তভোগী। এমনই কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো এখানে। সঙ্গত কারণেই নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হলো না।

চারপাশের জগতটা যেন তার কাছে অদৃশ্য

কর্মজীবী মা-বাবার একমাত্র মেয়ে। গত বছর ১১ তম জন্মদিনে সে উপহার হিসেবে পেয়েছে একটি স্মার্টফোন। কিছুদিন না যেতেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর স্ন্যাপচ্যাটে তার আইডি খোলা হয়ে গেল। নিজেই প্রোফাইলে বয়স বাড়িয়ে লিখল ১৬ বছর।

এখন তার অনেক ভার্চুয়াল বন্ধু। ফেসবুকে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনকে সে ব্লক করে রেখেছে, যাতে তার ছবি এবং পোস্ট কেউ দেখতে না পায়। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে পুরোটা সময় সে গাড়িতে বসে মোবাইল স্ক্রিনের দিকেই তাকিয়ে থাকে। চারপাশের জগতটা যেন তার কাছে অদৃশ্য, একমাত্র সত্য শুধু ভার্চুয়াল জগৎ। মা-বাবার ঘরে ফেরার সময় হলে সে ঠিকই চলে যায় পড়ার টেবিলে।

মা-বাবা দেখছেন, আগের চেয়ে মেয়েটা রেজাল্ট খারাপ করছে। সবকিছুতেই তার রাগ-জেদ অনেকটা বেড়েছে। সে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজনের সাথে আগের মতো কথাও বলে না। তার মধ্যে কৈশোরের প্রাণবন্ততাও আর দেখা যায় না। কারণ খুঁজতে গিয়ে মা-বাবা বুঝতে পারলেন, এ সবকিছুর জন্যে দায়ী তাদেরই দেয়া স্মার্টফোন।

স্মার্টফোনের কারণে বেড়েছে চোখের সমস্যা ও ঘাড়ব্যথা

সৎ নীতিবান একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর তিনি সকাল-বিকেল দুবেলা হাঁটতেন। মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। বই পড়া ছিল তার দৈনন্দিন কাজের অংশ। এর মাঝে টিভি সিরিয়ালের প্রতি কিছুটা আগ্রহ তৈরি হয়। কারণ তার স্ত্রী যখন টিভি সিরিয়াল দেখেন, তখন অন্য কিছু দেখার সুযোগ তিনি পেতেন না।

হঠাৎ করেই তার প্রবাসী পুত্র যখন একটি স্মার্টফোন বাবার জন্যে উপহার হিসেবে পাঠাল, তখন থেকে এই চিত্রগুলো হয়ে গেল অতীত। স্মার্টফোন হাতে পেয়ে একমাস কেটে গেল এটি কীভাবে চালাতে হয়, তা শিখতে গিয়ে।

পরবর্তীতে দেখা গেল, দিন-রাত ইউটিউবে নানান ধরনের ভিডিও আর টক-শো দেখছেন তিনি। সকালে হাঁটার ব্যাপারেও অনিয়মিত হয়ে গেছেন। এখন আর জীবনে রুটিন বলে কিছু নেই। ঘাড় গুঁজে সারাক্ষণ মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এতে তার চোখের সমস্যা এবং ঘাড়ের ব্যথাটাও বেশ বেড়ে গেছে।

সন্তান-সংসার কিছুই আর ভালো লাগে না

আমার বোন এবং তার স্বামী দুজনই চাকরিজীবী। তাদের দুই সন্তান, বড় ছেলের বয়স ছয় আর ছোট ছেলের বয়স আড়াই বছর। প্রতিদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরে স্বামী-স্ত্রী দুজনই যার যার স্মার্টফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সন্তান দুটোকে ভালোমতো সময় দেন না তারা।

আমার বোনকে আমি ভার্চুয়াল আসক্তি এবং এর কুফল সম্পর্কে জানালাম। তার প্রথম যুক্তিই হচ্ছে, ফেসবুকে তাকে অফিসের গ্রুপের এডমিন বানানো হয়েছে। কাজেই বাসায় এসেও এটার পেছনে তাকে সময় দিতে হয়। অবশ্য আমি দেখেছি, এডমিনের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি বেশি সময় ব্যয় করছেন নানা ধরনের কমেন্ট আর ভিডিও দেখে।

আশঙ্কার বিষয় হলো, আমার বোন বললেন, তার নাকি সন্তানদের প্রতি তেমন টান অনুভূত হয় না। মাঝে মধ্যে তিনি নাকি ভুলেই যান, তার আড়াই বছরের সন্তান আছে। সংসারও তার কাছে বিরক্তিকর মনে হচ্ছে, কিছুই ভালো লাগে না। বোনের স্বামীরও সংসার নিয়ে তেমন ভাবনা নেই, তিনিও ইন্টারনেটে ছবি শেয়ার নিয়ে ব্যস্ত।

ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকলে অস্থির বোধ করি

আমি ফেসবুক ব্যবহার করি ২০১৫ সাল থেকে। ভার্সিটির পড়াশোনা, ক্লাস ও পরীক্ষার সবরকম খোঁজখবর নিতে হতো ফেসবুকে। পরবর্তীতে অফিসের কাজের জন্যেও অহরহ দরকার পড়ত। শুরুতে আমার ব্যবহার মোটামুটি সীমিতই ছিল।

একটা সময় লক্ষ করলাম, প্রায় প্রতিদিনই আমি মাথাব্যথায় বেশ কষ্ট পাচ্ছি। কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম, যখন আমি বাসে বা অন্য কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্টে উঠি, পুরো পথ আমি স্মার্টফোনে ফেসবুক নিয়ে ব্যস্ত থাকি। এতে দীর্ঘসময় আমার ঘাড় ঝুঁকে থাকে এবং চলন্ত বাহনে মোবাইলে কিছু পড়তে গেলে চোখের ওপর অনেক চাপ পড়ে।

আরো খেয়াল করলাম, ইন্টারনেটে সংযুক্ত না থাকলে আমি অস্থির বোধ করছি। বাইরে থেকে বাসায় ফিরেই আমার প্রথম কাজ হলো ল্যাপটপ অন করে মুভি, সিরিজ ডাউনলোড দিয়ে রাখা। একটা শেষ করে আরেকটা পর্ব না দেখলে ঘুমই আসে না। এমনি করেই পার হয়ে যায় সময়। পরদিন ক্লান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠি আর সারাদিনের রুটিনটা-ও এলোমেলো হয়ে যায়।

৯ ঘণ্টা

বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম দিনে গড়ে নয় ঘণ্টা ব্যয় করে স্মার্টফোন ও কম্পিউটারে

৫০%

মার্কিন টিনএজারদের অর্ধেকই মনে করে তারা স্মার্টফোন আসক্ত

৩ জনে একজন

ইউনিসেফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে প্রতি তিন জন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একজনই শিশু

১৩৫ মিনিট

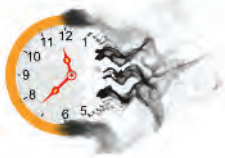

ফেসবুক-ইউটিউব জাতীয় তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন টিনএজার গড়ে দৈনিক সময় ব্যয় করে

১৫৩ জন

২০১৪-২০১৭ পর্যন্ত চার বছরে ঝুঁকিপূর্ণভাবে সেলফি তুলতে গিয়ে নিহতের সংখ্যা

আসক্তি মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন তরুণরা

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারি শিথিলায়ন ক্যাসেটের মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে কোয়ান্টাম। সিকি শতাব্দীর এ পথচলায় কোয়ান্টাম মেডিটেশনের সাথে যুক্ত হয়েছেন দেশের নানা শ্রেণি-পেশা-বয়সের মানুষ। চার দিনের কোর্সে অংশ নিয়ে লাখো মানুষ অর্জন করেছেন সঠিক জীবনদৃষ্টি। তারা রোগকে রূপান্তরিত করেছেন সুস্থতায়, অশান্তিকে প্রশান্তিতে, অভাবকে প্রাচুর্যে এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যে।

নেতিবাচকতা ও হতাশায় আচ্ছন্ন বহু তরুণ জীবন বদলের এ অভিযাত্রায় অংশ নিয়ে উপলব্ধি করছে নিজের মেধা ও যোগ্যতাকে। ভার্চুয়াল আসক্তির যুগ-যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের জন্যেও অন্যতম সহায়ক-শক্তি হিসেবে কাজ করছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স। মেডিটেশনের মাধ্যমে আত্ম-আবিষ্কার ও আসক্তি মুক্তির কয়েকটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হলো।

ভার্চুয়াল ভাইরাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জেনেছি

মিনহাজ উদ্দিন আহমদ শোভন

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ভার্চুয়াল ভাইরাস বিষয়ে গুরুজী যা বলেছেন, এর প্রতিটি কথাই আমি সমর্থন করি। এই ভাইরাসের বিপদ যে কত সুদূরপ্রসারী এবং ভয়ানক, তা এ কোর্সে না এলে অনুভব করতে পারতাম না।

কম্পিউটার, স্মার্টফোন এসব ডিভাইসের প্রকৃত ব্যবহার না জেনেই একরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আমরা এসব পেয়ে গিয়েছি। আর এজন্যেই আমরা যা খুশি তা করছি। ইন্টারনেটের ভুল ব্যবহার আমাদের প্রজন্মকে অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হয়েছে, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স আমাদের এই ভার্চুয়াল ভাইরাস থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করবে। এখানে এসে মেডিটেশন করে আমার মনোবল বেড়েছে। এখন মনে হচ্ছে, পরীক্ষার আগে এই কোর্সটি করাটা আমার পড়াশোনার জন্যে খুব ভালো হয়েছে। কারণ সামনের দিনগুলো আমি পরীক্ষার জন্যে আরো ভালো প্রস্তুতি নিতে পারব এবং কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের আসক্তি থেকে দূরে থাকতে পারব।

[এইচএসসি পরীক্ষার্থী, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ৪৩৯ ব্যাচ]

এবার জয় হবে আমার ইচ্ছাশক্তির

ফারহানা আক্তার

ফেসবুক ও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমি এত ব্যস্ত থাকতাম যে, পরিবারের সবাই পাশে থাকলেও তাদের সাথে কথাই বলতাম না। ফেসবুকে সেসব বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম, যারা কোনোদিন আমার বিপদে-আপদে এগিয়ে আসবে কিনা আমি জানি না। এ থেকে বেরিয়ে আসার পথ আমি খুঁজছিলাম কিন্তু কোথাও তা পাচ্ছিলাম না। কোর্সে এসে আমি সমাধানের পথ পেলাম।

আমি উপলব্ধি করেছি, স্মার্টফোন বা গুরুজীর ভাষায় শয়তানের বাক্স নিয়ে আর মেতে থাকা যাবে না। শয়তানের জয় আর হতে দেয়া যাবে না। এবার আমার ইচ্ছাশক্তির জয় হবে।

কোয়ান্টামে আসার আগে আমি ভীষণ ব্র্যান্ড সচেতন ছিলাম। মনে হতো, অমুক ব্র্যান্ডের জিনিস না থাকলে আমার জীবন বৃথা। মেডিটেশন করে মনে হচ্ছে, ব্র্যান্ডের পেছনে ছুটে বেড়ানো অর্থহীন। আল্লাহ আমাকে মহামূল্যবান একটি মস্তিষ্ক দিয়েছেন এবং এই মস্তিষ্ককে কাজে লাগিয়েই আমি সবকিছু জয় করতে পারব।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩৪ ব্যাচ]

মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হতে চাই

রত্না সাহা

স্মার্টফোন, বন্ধুবান্ধব আর ফেসবুকে আমি এত আসক্ত ছিলাম যে, মা-বাবা ও পরিবারের কাউকে আমার ভালো লাগত না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে অকারণে মায়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম। বন্ধুরা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনোকিছুরই গুরুত্ব ছিল না। পড়ালেখাতেও আমার মনোযোগ ছিল না।

এরপর আমার মাসি আমাকে কোয়ান্টামের সাদাকায়ন ও আলোকায়ন প্রোগ্রামে নিয়ে আসেন। প্রথম প্রথম এ প্রোগ্রামগুলো ভালো লাগত না। কিন্তু আস্তে আস্তে আমার ভালো লাগতে শুরু করে এবং বুঝতে পারি, আমার জীবন গড়ার জন্যে প্রয়োজনীয় কথাগুলোই কোয়ান্টাম বলছে। এই ভালোলাগা থেকেই আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

কোর্সে এসে আমি আমার ভুলগুলো উপলব্ধি করেছি। ফেসবুক আর ইন্টারনেটের আসক্তি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছি। আর জেনেছি, মা-বাবার মতো নিঃস্বার্থভাবে পৃথিবীতে আর কেউ ভালবাসে না। আর তারা পাশে থাকলে জীবনে সফল হওয়াটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আজকের পর থেকে আমি নিজের ভুলগুলো শুধরে মা-বাবার আদর্শ মেয়ে হতে চাই।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, ক্যামব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ। ৪৩৪ ব্যাচ]

মেডিটেশন করে নতুনভাবে বাঁচতে শিখলাম

শেখ ফারদিন রহমান

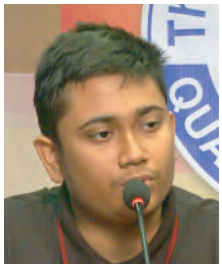

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে আসার আগে আমি সবসময় ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। স্কুল আর কোচিং ক্লাসের বাইরে কোনো ধরনের খেলাধুলা বা শারীরিক কসরতে আমার একটুও আগ্রহ ছিল না। দৌড়, ফুটবল, ক্রিকেট এগুলো থেকে আমি দূরে সরে যাচ্ছিলাম।

এ-ছাড়াও এসবে আসক্ত হওয়ার পর থেকে আমার আচরণগত পরিবর্তন আমি নিজেই লক্ষ করছিলাম। কারো সাথে ঠিকমতো কথা বলতাম না, মিশতাম না। দীর্ঘসময় ইন্টারনেটে পড়ে থাকার কারণে পড়াশোনায় বেশ পিছিয়ে পড়ছিলাম। মা-বাবার সাথেও দুর্ব্যবহার করতাম অনেক সময়।

মা-বাবা আর আত্মীয়স্বজনের উৎসাহে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নিলাম। আসার আগে আমার দ্বিধা ছিল–এ কোর্স আমাকে কী শেখাবে?

কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করে মনে হচ্ছে, আমি নতুনভাবে বাঁচতে শিখলাম। এখন বুঝতে পারছি, এই ভার্চুয়াল জগতে আমি কত সময় নষ্ট করেছি! আসলেই ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, মেসেঞ্জার আমাদের কখনো ভালো কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। বরং এগুলো একজন মানুষকে মেধাশূন্য করে দেয়।

[শিক্ষার্থী, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন। ৪৪১ ব্যাচ]

ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি

নওশিন তাবাসসুম

আমি একটি জিনিসে খুব বেশি আসক্ত ছিলাম। সেটা হলো, সেলফি। প্রতিদিন সকালে-বিকেলে-রাতে আমি সেলফি তুলতাম। ঘুম থেকে উঠেই সেলফি না তুললে আমার ভালো লাগত না।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের এই চার দিন অংশ নিয়ে বুঝতে পারলাম, ঘন ঘন সেলফি তোলা একটি মানসিক সমস্যা। এখন যদি আমি সেলফি তুলতে যাই, ভেতর থেকেই একটা দ্বিধা কাজ করে।

এ-ছাড়াও আমার ফেসবুকের প্রতি নেশা ছিল। কোর্সে এসে এটাও জানলাম যে, ফেসবুক আসক্তি মাদকাসক্তির মতোই ভয়ংকর। তাই এটা থেকেও আমি বিরত থাকার চেষ্টা করছি।

কোর্সে গুরুজী এসবের ক্ষতিকর দিকগুলো যেভাবে তুলে ধরেছেন, তা আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করেছে। কোয়ান্টাম মেথডকে ধন্যবাদ, কারণ এখানে এসে আমি নিজের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছি।

[শিক্ষার্থী, একাদশ শ্রেণি, নিউ গভ. ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী। ৪৪০ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : *আমার মেয়ে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে মোবাইল ফোন কেনার জন্যে বাসায় অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। কিন্তু আমরা তাকে এটা দিতে চাচ্ছি না। আবার তাকে ম্যানেজ করতেও পারছি না। এ অবস্থায় কী করণীয়?*

উত্তর : এই সমস্যাটা শুধু আপনার নয়। এ সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। এখানে আপনাকে দৃঢ় হতে হবে কিন্তু রূঢ় নয়। অর্থাৎ তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে।

কারণ আমরা খুব স্পষ্ট করে বলছি, ১৮ বছর বয়সের আগে সন্তানকে স্মার্টফোন দেবেন না। দিলে আপনাকেই পরে পস্তাতে হবে। তাই সন্তানকে মমতা দিয়ে বুঝিয়ে বলবেন যে, মা, তোমার এখনো বয়স হয় নি। বয়স হোক, তারপর তোমাকে দেয়া হবে। আর যদি ভাবেন–অশান্তি করছে, দিয়ে দেই। স্মার্টফোন দিলে অশান্তির পরিমাণ আরো বাড়বে এবং সন্তান আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই এ ব্যাপারে আপোস করা যাবে না।

এর মধ্যে সংবাদপত্রে রিপোর্ট দেখলাম, আমাদের দেশে নাকি বাল্যবিবাহ বেড়ে গেছে এই স্মার্টফোনের বদৌলতে। এরা সব নাকি স্কুলের ছেলেমেয়ে। অতএব সতর্ক থাকতে হবে যে, সন্তান কার সাথে যোগাযোগ করছে। তার বোঝার বয়স না হওয়া পর্যন্ত যোগাযোগের সুযোগগুলো সীমিত করতে হবে। তাই সন্তানকে বোঝান এবং তাকে ভার্চুয়াল ভাইরাস ফোল্ডার ও বুলেটিন পড়তে দিন।

এ বুলেটিন পরিবারের সবাইকে পড়াবেন, প্রতিবেশী-আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের পড়াবেন। কারণ চারপাশের মানুষ যদি অবুঝ থাকে, আপনি আপনার সন্তানকে কতক্ষণ রক্ষা করবেন? নিজের সন্তানকে রক্ষা করার জন্যেই চারপাশের মানুষকে বোঝাতে হবে ভার্চুয়াল ভাইরাসের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে।

সবার আগে নিজেকে দিয়ে শুরু করতে হবে। পরিবারের জন্যে যে সময়টা রেখেছেন, তা পুরোপুরি পরিবারকে দিন। রাতে একসাথে খাবেন, সবাই মিলে গল্প করবেন। ফেসবুক, টিভি, স্মার্টফোন নিয়ে পরিবারের একেকজন একেকদিকে ব্যস্ত থাকবেন না। ভার্চুয়াল জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে ঘর আর পরিবারের দরকার কী?

যখনই রাত ১১টা, স্টপ এভরিথিং। ১১টার পরে কোনো টিভি নেই, কম্পিউটার নেই, কোনো স্ক্রিন নেই। ছেলেমেয়ে যদি বলে পড়া আছে, পড়ার কাজে কম্পিউটার-ল্যাপটপ চালু রাখতে হবে। বলবেন–সকালবেলা পড়বে বাবা। সারারাত তুমি জেগে থাকবে আর সকালে ঘুমাবে, তা হবে না। যা করার সকালে করবে।

সন্তানকে বলুন, তুমি কম্পিউটারে কাজ করবে, আমি তোমার মা/ বাবা হয়ে ঘুমাব, তা হয় কীভাবে? তোমার ছোটবেলায় তা-তো করি নি। বরং তুমি ঘুমিয়েছ, আমি জেগে ছিলাম, যাতে তোমার ঘুমের কোনো অসুবিধা না হয়। অর্থাৎ কৌশল বুঝতে হবে। যদি আপনি দৃঢ় হতে না পারেন, কুশলী হতে না পারেন, এই ছেলে বা মেয়ে আপনার থাকবে না।

সন্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করার কিছু নেই। মা-বাবা হিসেবে মমতা থাকবে, কিন্তু নৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে দৃঢ় হবেন। সন্তান যদি বুদ্ধিমান হয়, আপনার চেয়ে জ্ঞানী হয়, সন্তানকে স্যালুট করবেন যে, বাবা, আমি দেখছি, তোমার জ্ঞান আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু সন্তানের নির্বুদ্ধিতার কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না। যারা এটা করেছেন, তারা ভুল করেছেন। পরিস্থিতি বরং আরো জটিল হয়েছে।

তবে সন্তানের সাথে দুর্ব্যবহার করবেন না। রাগারাগি নয়, গামা লেভেল নয়, সবসময় আলফা লেভেল। কারণ তার দোষ নেই। সে বুঝতে পারছে না বলেই অশান্তিটা করছে। যখন বুঝবে, তখন আর করবে না।

প্রশ্ন : *আমার ছেলে সারা দিন-রাত মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকে। যদি ওগুলো থেকে দূরে থাকতে বলি, তাহলে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করে এবং বাসার মধ্যে ভাঙচুর করে। বড় বোনদের কোনো কথা শোনে না। তার বয়স ২০ বছর। ভার্সিটিতে ভর্তি করিয়েছি, পড়াশোনাও করবে না। ছেলেকে নিয়ে কী করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।*

উত্তর : আসলে গাছের ডাল একবার যদি বাঁকা হয়ে যায়, সেটাকে সোজা করা খুব কঠিন। আপনি যেহেতু মা, তাকে নিয়মিত মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝান, দিনে দুই বেলা।

সন্তানের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করুন। আলাপ কীভাবে শুরু করা যায়–এটা চিন্তা করবেন। কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করবেন না। অর্থাৎ সারাক্ষণ একই কথা বলবেন না। তার সাথে বন্ধুত্বের পথটা খোলা রাখুন।

বোঝা যাচ্ছে যে, আপনার এক ছেলে। না হলে সাধারণত এত বাঁকে না। আহ্লাদ দিয়েছেন, এখন আহ্লাদের শাস্তি তো আপনাকে পেতে হবে। মা-বাবারা এ ভুল করেন–ছোটবেলায় অতিরিক্ত আহ্লাদ দিয়ে ফেলেন। তাদের কথা হলো, আমার ছেলে, বংশের চেরাগ!

কিন্তু এই চেরাগটা তো ঠিকমতো রাখতে হবে, যাতে বাতিটা জ্বলে। এখন ২০ বছরের ছেলেকে আপনি বেশি কিছু করতেও পারবেন না। কারণ সে আসক্ত, ভার্চুয়াল ভাইরাসে আক্রান্ত। সারা দিন-রাত মোবাইল আর কম্পিউটার নিয়ে পড়ে থাকা আর মাদক নিয়ে পড়ে থাকার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

বলা যায়, একটাই তফাৎ, তা হচ্ছে মাদক সম্পর্কে আমরা সচেতন, মা-বাবা হাতে তুলে দেন না আর ভার্চুয়াল ভাইরাস মা-বাবা নিজেই সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন। ছেলে যে অনেক স্মার্ট এবং সে কম্পিউটার কত ভালো বোঝে, এটা মা-বাবা গর্ব করে বলেন। কিন্তু স্মার্ট হতে গিয়ে সন্তান কী করছে, সেটা তারা বোঝেন না। সমস্যাটা হয় সেখানেই।

ছেলেমেয়েকে ছোট থেকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে আনাটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। যে বখে গেছে, তাকে নিয়ে কতটুকু কী করা যাবে, বলা মুশকিল। তবে যাদের সন্তান এখনো ছোট আছে, তাদের ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতন হোন।

স্মার্টফোন বা কম্পিউটারে ভিডিও ছেড়ে শিশুকে খাওয়ানোর অভ্যাস করবেন না। স্মার্ট টিভির রিমোট কন্ট্রোল শিশুর হাতে দেবেন না। কারণ স্মার্টফোনে যা করা যায়, যে সাইটগুলোতে যাওয়া যায়, স্মার্ট টিভিতেও সেই সাইটগুলোতে যাওয়া যায়।

আর শৈশব থেকেই সন্তানকে একটার পর একটা সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ছবি আঁকা, গান-আবৃত্তি ইত্যাদি। ফেসবুক-ইন্টারনেট-স্মার্টফোন ব্যবহারের অবসর সময় যেন সে না পায়।

সন্তানের বন্ধু হবেন কিন্তু নৈতিক ব্যাপারে দৃঢ় হোন। মনে রাখবেন, সন্তান সবসময় মানসিকভাবে দৃঢ় মা-বাবাকে পছন্দ করে। তাই সন্তানকে আদর করবেন, কিন্তু শৃঙ্খলার মধ্যে রাখবেন। অর্থাৎ ছোটবেলা থেকেই তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তাকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে। নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ এবং অনুসরণ করতে হবে। ছোটবেলা থেকেই আল কোরআনের মর্মবাণী পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সেইসাথে সন্তানকে নিয়ে মেডিটেশন করুন। মেডিটেশনে সন্তানের সাথে যে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে, তা অপূর্ব। এর ফলে আপনি তাকে যে-কোনো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। আর পরিবারের প্রত্যেকটা কাজে বয়স অনুযায়ী তাকে অংশীদার করুন। আপনি যদি আজ সচেতন না হন, পরে আপনাকে অবশ্যই অনুতপ্ত হতে হবে।

প্রশ্ন : *আমার ছোট দেবর এই বছর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হয়েছে। প্রথম পরীক্ষায় পাঁচটি বিষয়ের তিনটায় শূন্য পেয়েছে। সে বলে, সে নাকি পড়াশোনা বোঝে না। সে সারাদিন মোবাইল ফোন নিয়ে পড়ে থাকে। বোঝালে বোঝে না, খেপে যায়। কোয়ান্টামে আনতে চেয়েছি, বলে আমার কোয়ান্টাম লাগবে না। এসব থেকে তাকে কীভাবে ফেরানো যায়?*

উত্তর : একজন ছাত্র যদি পাঁচটি বিষয়ের তিনটিতেই শূন্য পায়, তার আসলে পড়াশোনার দরকার নেই। তাকে উপার্জনে ঢুকিয়ে দিন। কিছুদিন সে উপার্জন করুক। উপার্জন করতে গিয়ে যে কষ্ট, এটা সে দেখুক। তারপর যদি পড়াশোনায় সে আগ্রহী হয়! এটা হলো একটি প্রক্রিয়া।

আর কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া হলো, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। যেহেতু আপনার দেবর, আপনি একজন বড় বোনের মতো তাকে বোঝাতে পারেন। আর যদি না পারেন, আপনার স্বামীকে বলুন। আপনি কমান্ড সেন্টারে বোঝাতে চেষ্টা করুন এবং আপনার স্বামীকে দিয়ে বাস্তবে বোঝানোর চেষ্টা করুন।

এ সমস্যার কথা আপনার স্বামীকে এখনই জানান। অনেক সময় আমরা পরিবারে অনেক কিছু গোপন রাখি–জানালে আবার কী অশান্তি হয়! কিন্তু অশান্তি যা হওয়ার তা হবেই। এখন হলেও হবে, ছয় মাস পরে হলেও হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বরং বেশি হবে। তাই পারিবারিক এই তথ্যগুলো সবসময় অভিভাবককে বা যিনি সমাধানের উদ্যোগ নিতে পারবেন, তাকে শুরুতেই জানানো উচিত।

এ মাসের অটোসাজেশন

সকল আসক্তি ও প্রবৃত্তির
শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে আমি হবো
আত্মজয়ী বীর।

ভার্চুয়াল ভাইরাস ॥ বাড়ছে সচেতনতা

২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের এলজিইডি মিলনায়তনে শ্রদ্ধেয়া মা-জীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় পারিবারিক ওয়ার্কশপ। এতে অংশ নেন তিন শতাধিক গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার। আলোচনা ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের সামনে তুলে ধরা হয় প্রযুক্তি আগ্রাসন কীভাবে বিপর্যস্ত করে তুলছে তরুণ প্রজন্মকে। এর সর্বনাশা হাতছানি থেকে পরিবার ও সমাজকে বাঁচানোর জন্যে শ্রদ্ধেয়া মা-জী অংশগ্রহণকারীদের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহাখালীর টিএন্ডটি আদর্শ মহিলা কলেজে আয়োজিত কোয়ান্টাম সভায় অংশ নেন মোট ১২৪ জন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। অংশগ্রহণকারীদের সচেতন করে তুলতে দেখানো হয় ফাউন্ডেশন নির্মিত দুটি ডকুমেন্টারি–ভার্চুয়াল ভাইরাস ও সেলফি সিনড্রোম।

ঢাকার লালমাটিয়ায় একাডেমিয়া স্কুলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ নেন ১১৭ জন শিক্ষার্থী ও অভিভাবক। আর শিক্ষকদের ভার্চুয়াল ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে একাডেমিয়া স্কুলের লালমাটিয়া, পল্লবী ও গুলশান শাখায় মোট তিনটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

পাবলিক বাসের জানালায় *সেলফি সিনড্রোম* ও *স্মার্টফোন আসক্তি* স্টিকার লাগাতে গিয়েছিলেন ফাউন্ডেশনের একজন কোয়ান্টিয়ার। বাসের কর্মীরা স্টিকারের লেখা পড়ার পর নিজেরাই জানালার কাচ পরিষ্কার করে দিয়েছেন যেন স্টিকারটি ভালোভাবে সবার চোখে পড়ে।

মধ্যবয়স্ক আরেক ভদ্রলোক এই স্টিকার দেখে বলে উঠলেন, দেয়ালে না, এটা আমার কপালে লাগান। আমার সন্তান তো হাতছাড়া হয়ে গেছে। ফেসবুকে আসক্ত হয়ে সে দিন দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এক চায়ের দোকানে স্টিকার বিতরণ করতে গেলে শুরুতে দোকানদার নিষেধ করেন। কিন্তু যখন দেখলেন স্টিকারে ফেসবুক আসক্তি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে তখন সাথে সাথে তিনি বললেন, ভাই, এটা দোকানের প্রত্যেকটি দেয়ালে লাগান, পারলে আমার বাড়িতেও লাগান। আমার স্ত্রী রান্না করতে করতেও ফেসবুক দেখতে থাকে।

এই হলো বাস্তবতা, ভার্চুয়াল ভাইরাস এভাবে ভোগাচ্ছে সবাইকেই। ভুক্তভোগী সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। হয় নিজে আসক্ত, নতুবা পরিবারের সদস্য-আত্মীয়-বন্ধুরা। মাদকাসক্তির চেয়েও ভয়ংকর এ আসক্তি সম্পর্কে ফাউন্ডেশন ২০০৯ সাল থেকেই সচেতন করে আসছে।

তবে আনুষ্ঠানিকভাবে ভার্চুয়াল ভাইরাস ক্যাম্পেইন শুরু হয় এবছর ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার আইডিইবি হলে অনুষ্ঠিত আর্ডেন্টিয়ার ওয়ার্কশপের পর। ইতোমধ্যেই ক্যাম্পেইনটি সর্বমহলে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে। এ সম্পর্কিত বুলেটিন, ফোল্ডার ও স্টিকার বিতরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস, মার্কেটে। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে একাধিক সেমিনার আয়োজন করছে সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলগুলো। সেমিনারে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত *ভার্চুয়াল ভাইরাস* ও *সেলফি সিনড্রোম* ভিডিও দেখানো হয়েছে।

ঢাকার যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভার্চুয়াল ভাইরাস সচেতনতা সভা আয়োজন করা হয়েছে সেগুলো হলো–আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, একাডেমিয়া স্কুল, মোহাম্মদপুর মেধাকুঞ্জ স্কুল, মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল, টিএন্ডটি আদর্শ মহিলা কলেজ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং গুলশান কলেজ। এ-ছাড়াও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি. ও রূপগঞ্জ ৯নং কমিশনার ওয়ার্ডে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকার বাইরে বগুড়ায় সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ ও নাটোরে গুরুদাসপুর উপজেলার বি.আর.ডি.পি. ট্রেনিং সেন্টারে আয়োজিত হয়েছে সচেতনতামূলক সেমিনার।

ভার্চুয়াল ভাইরাস বুলেটিন, ফোল্ডার ও স্টিকার বিতরণ করার অভিজ্ঞতা জানাতে যোগাযোগ করুন–
bulletin@quantummethod.org.bd

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে অর্থ সচিব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী

মানবিক যোগাযোগ বাড়ালে সমাজ সুন্দর হবে

২৩ ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কমপক্ষে ২৫ বার রক্তদান করেছেন এমন ১৬৫ জন রক্তদাতাকে সম্মাননা জানানো হয়। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম আয়োজিত ১৬ তম গোল্ডেন ডোনার সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত রক্তের বিকল্প আবিষ্কৃত হয় নি। তাই রক্তের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কোয়ান্টামের এই কার্যক্রমের সাথে আমি নিজেও যুক্ত হতে চাই।

আমি মনে করি, রক্তদাতাদের মিছিলে আরো মানুষ সংযুক্ত হলে আমাদের মানবিক যোগাযোগ বাড়বে। বর্তমান সময়ে মানবিক যোগাযোগ কমে গেছে বলেই দিন দিন ফেসবুক আসক্তির পরিমাণ বাড়ছে। রক্তদানের মতো মানবিক যোগাযোগগুলো সমাজে বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবেই নানা রকম আসক্তির প্রবণতা কমে যাবে।'

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারি পরিচালক ডা. এ বি এম ইউনুস। তিনি বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত পাঁচটি টেস্ট নিশ্চিত করার পরই কেবল কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্ত সরবরাহ করা হয়। তাই এটি এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটি রেফারেন্স ল্যাবে পরিণত হয়েছে।'

সভাপতির বক্তব্যে মাদাম নাহার আল বোখারী বলেন, 'রক্তদানের পর এই রক্ত কার জীবন বাঁচাচ্ছে রক্তদাতারা তা জানেনও না। কিন্তু নীরবে তারা মুমূর্ষুকে বাঁচানোর জন্যে রক্ত দিয়ে যাচ্ছেন। রক্তদাতাদের এই নীরব দানের প্রতিদান স্রষ্টা অবশ্যই দেবেন।'

এ আয়োজনে প্রত্যেক রক্তদাতাকে সম্মাননা সার্টিফিকেট, আইডি কার্ড ও সুদৃশ্য ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বইমেলায় কোয়ান্টাম

স্টলের দৃষ্টিনন্দন সাজসজ্জা আকৃষ্ট করে রুচিশীল পাঠকদের

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় ৭ম বারের মতো অংশগ্রহণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। পুরো ফেব্রুয়ারি মাসজুড়েই স্টলে সর্বস্তরের পাঠকদের সমাগম ছিল লক্ষণীয়।

কোয়ান্টাম স্টলে ড. এম শমশের আলী

২৩ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম স্টলে আসেন বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক ও লেখক অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী। তাকে ঘিরে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত তিনি *ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন* বইতে পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন। ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে মেডিটেশন ও কোয়ান্টাম চেতনার উপযোগিতা নিয়ে রচিত বইটি ইতোমধ্যেই পেয়েছে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা।

ইসলাম বিজ্ঞান মেডিটেশন বইতে ড. এম শমশের আলীর অটোগ্রাফ নিতে পাঠকদের ভিড়

বইমেলায় নতুন বই ॥ কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

এবারের মেলায় কোয়ান্টাম প্রকাশ করে নতুন বই– *কর্মব্যস্ত সুখী জীবন*। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খানকে। কর্মব্যস্ততা, সেবা, স্বাস্থ্য, পরিবার ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে নির্বাচিত ৩২টি নিবন্ধের একটি অনবদ্য সংকলন এ বইটি।

ভোগবাদী পণ্য-আগ্রাসন আর নিত্যনতুন প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে বিপর্যস্ত হতাশ ও পরিবার-বিচ্ছিন্ন আধুনিক মানুষের যুগ-যন্ত্রণার কার্যকরী প্রতিষেধক হয়ে উঠতে পারে *কর্মব্যস্ত সুখী জীবন* বইটি। প্রকাশের প্রথমদিন থেকেই বইটি পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : মার্চ ২০১৮ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 48319377, 9355756 **Mobile :** 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd